গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

অগাস্ট মাসটি শুধু ভারতবর্ষ নয়, বাংলাদেশের ইতিহাসেও এক চির স্মরণীয় সময়। যদিও অতীতে দুইটি দেশের কাছে এই মাসটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বার্তা বহন করে এনেছিল – একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ, অন্যদিকে হারানোর বিষাদ; তবুও আজও বিদেশী-দের হাতে নির্মম ভাবে দ্বিখণ্ডিত বাঙালি জাতির কাছে এই মাসটি রয়ে গেছে শুধুই স্মৃতি চারণের আর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ক্ষণ হয়ে। বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চিরকালের জন্যই অখণ্ড এবং অটুট...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩
অগাস্ট ২০২১

মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, দালান জাহান, গোবিন্দ মোদক, কাজী আনারকলি, পল্টু ভট্টাচার্য, রিয়া মিত্র এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

স্বাধীনতা শব্দটি মাত্র চার অক্ষরের হলেও, এর মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে রয়েছে অজস্র আবেগ-অনুভুতি, অনেক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অফুরন্ত হারানো আর ফিরে পাওয়ার গল্প। ভাবতে খুব অবাক লাগে যে – আজ আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে, স্বাধীনতা শব্দটির সংজ্ঞাই বদলে ফেলছেন।

এই সুখের চাবিকাঠি হাতে পেতে কত রক্ত ঝরেছে, তার হিসাব নেই। সেই সব মহানুভব মহাপুরুষদের সুদৃঢ় সংকল্প ও বলিদানকে কি বর্তমান সমাজ মনে রেখেছে? নাকি শুধুই জাতীয় দিবসগুলিতে শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপনের আড়ালে আতিশয্য ও বাহুল্যতাই প্রদর্শিত হয় আজকাল? আমরা স্বাধীনতা পেলেও সত্যিই কি এখন প্রকৃত অর্থে স্বাধীন?

একটা দেশ তথা একটি জাতি তখনই স্বাধীন হয়, যখন সেই দেশ বা জাতির অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিরোধ থাকেনা, নিজমত প্রকাশ করতে গেলে পরিণতি স্বরূপ মৃত্যু ঘটেনা, থাকেনা রাজনৈতিক দলাদলি কিংবা গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ। মানুষকে প্রাণভয়ে গৃহহারা হয়ে থাকতে হয়না দিনের পর দিন...

প্রকৃত স্বাধীন দেশে থাকে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক, ক্রীড়া-বিষয়ক, বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের বিপুল প্রয়াস। সর্বোপরি একতা।

সময় এসেছে, ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে এসে জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকানোর। চোখ খুলে দেখুন, ভাবুন...

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন ■

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ আমার ভারত ফিরিয়ে দাও...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (৬)

আজ ২০১৬ সালের ২৯ শে অক্টোবর শনিবার কালী পুজো। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে গায়ে জ্বর এবং পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে চলতে শুরু করেছি। এখানে কালী পুজোর খুব একটা প্রচলন নেই। দেওয়ালী এদের প্রধান অনুষ্টান।

দেওয়ালী যেহেতু এদের অন্যতম প্রধান উৎসব তাই ঘর সাজানো এবং কেনাকাটার পালা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। আমরা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলার সময় এই সবই প্রত্যক্ষ করছি।

একে তো পায়ের ব্যাথা তার উপর জ্বর। কি যে কষ্ট হচ্ছে তা মা নর্মদাই জানেন। এখন আমরা নদী থেকে কিছুটা দূরে গ্রামের পথ ধরে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি। পিছনে পড়ে থাকল বুলচা, সাকোল, গজনী আরো কত গ্রাম। সেই সব গ্রামের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। হঠাৎ দূরে নদী দেখা গেল। গ্রামটির নাম শুনলাম রেবাবানখেড়ী।

এখন দুপুর সাড়ে বারোটা। শরীরের সহ্য ক্ষমতা শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। আমরা একটি রাম মন্দিরে এসে

পৌঁছালাম। সদা হাস্যময় মদন মোহনজী মহারাজ আমাদের সানন্দে আশ্রয় দিলেন এবং রাতে এখানে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। যদিও আমাদের ট্রেন পরশুদিন তাই আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের চলার কথা। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা দেখে সবাই আজই পরিক্রমা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নর্মদা তীরে এই পর্যায়ের মতো পরিক্রমা সমাপ্ত করলাম।

মহাভারতে কুন্তি একবার শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, “তুমি আমাকে সব সময় দুঃখের মধ্যে রাখো। তাহলে আমি তোমাকে প্রতি নিয়ত স্মরণ করব। সুখে থাকলে তোমাকে ভুলে যাব।”

কৃপাময়ী মা নর্মদা তাঁর এই তপবলহীন পুত্রকে অপার স্নেহে শারীরিক কষ্টের মধ্যে রেখে প্রতিনিয়ত ‘নর্মদে হর’ বলিয়ে নিচ্ছেন। যেহেতু নর্মদা পরিক্রমা একটি তপস্যা, তাপ সহ্য করার শক্তি মা দিচ্ছেন, এই ‘নর্মদে হর’ ধ্বনির মধ্যে দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি এই তপস্যাতেই প্রারব্ধ ক্ষয় হবে, হবেই।

পরিক্রমাকারীরা এসেছেন শুনে গ্রামের বেশ কিছু ভক্ত এলেন আমাদের সাথে পরিচিত হতে। আমার অবস্থা দেখে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। একজন আমাদের কাপড়ের জুতো দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু আমার নেওয়ার ইচ্ছা নেই। ঘটনাচক্রে আমাদের পায়ের মাপে জুতো না থাকায়, মা নর্মদা আমার এই ছোট্ট প্রার্থনাটি শুনলেন।

নমামি দেবী নর্মদে

মন্দিরের সামনেই বাসস্ট্যান্ড। সকাল নয়টায় বাস ছাড়ার কথা। বহু কষ্টে বাসে উঠে বসে আছি, কিন্তু বাস ছাড়ল সকাল সাড়ে দশটায়। আজ দেওয়ালী ৩০শে অক্টোবর, সওয়ারী না হওয়ার জন্য বাস ছাড়তে দেরী হল। গত বছরও আমরা দেওয়ালীর দিন পরিক্রমার পথে ছিলাম। অভিজ্ঞতা হয়েছিল অমরকণ্টক থেকে সহস্রধারা।

কুড়ি কিলোমিটার বাসে করে এলাম সোহাগপুর। নেমেই আর একটি বাস – গন্তব্য হোসেঙ্গাবাদ। দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটার। প্রায় দুটো নাগাদ হোসেঙ্গাবাদ বাস স্টপেজ থেকে এলাম শেরনী ঘাটে। কোঠারী প্যাটেলজীর কৃপায় একটি ভালো ঘর পেয়ে গেলাম। রাত্রিটা এখানেই কাটাতে হবে। প্যাটেলজী আমাদের খাট, কম্বল, বিছানা সবই দিলেন।

আজ ৩১শে অক্টোবর। দেওয়ালীর পরের দিন। এ অঞ্চলে কোনো গাড়ী থাকে না। বহু কষ্টে একটি অটো ২৫০ টাকার বিনিময়ে আমাদের ইতাশ্রী পৌঁছে দিতে রাজী হল। সকাল সাড়ে ন'টায় আমাদের কলকাতা যাওয়ার ট্রেন। দিব্যানন্দজীর ট্রেন সকাল ন'টায়। এই হোসেঙ্গাবাদের নাম আগে ছিল রেবা নগর। আবার কিছু দিনের প্রতীক্ষা। ফিরে চললাম কলকাতা।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ রাখি বন্ধন...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জী ✧ বয়সঃ ১৪ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

(৯ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

চৈত্রে আমের মুকুলে ছেয়ে যায় পল্লীগ্রাম। যেন আমগাছটি আইবুড়োর অভিশাপ কাটিয়ে নববধূর সাজে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। ছোট ছেলেরা অপেক্ষা করছে কবে ঝড়বৃষ্টি আসবে; আমপাকা পোকা ডাকবে। বোধ করি গাছ থেকে আম পাড়াতে যে সুখ তার চেয়ে ঝড়বৃষ্টিতে আম কুড়ানোতে দ্বিগুণ সুখ। হঠাৎ পশ্চিম কোণে মেঘ জমে। নিমেষের ঝড়ে যেন প্রকৃতি কালীর মতো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে উগ্রচণ্ডীবেশে মর্ত্যলোকে আবির্ভূতা হন। কয়েক মিনিটের ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। মুহূর্তেই বউ সেজে থাকা আমের গাছটি যেন লাল শাড়ি ছেড়ে সাদা শাড়ি পরে। বধূর অকাল স্বামী বিয়োগ বিধবার বসনে প্রকৃতি যেন তার স্বীয় সৌন্দর্য হারায়।

ঝড়ে নিরঞ্জনের মায়ের পেঁপের গাছটা উপড়ে পড়ে; ওর মায়ের মরাকান্নাতে যেন গ্রামের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। হাউমাউ করে কাঁদায় যেন শান্তি নেই; সুর করে না কাঁদলে তৃপ্তি মেলে না। তাই ঝড় থামার পর নিরঞ্জনের মা সুর করে কাঁদছেন। দু-একজন এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে আর

আফসোস করে বলছে, ইশ্ আর কদিন পরেই ফল দিতো; এমন করে গাছটা উপড়ে পড়লো! অথচ নিরঞ্জনের মায়ের এ হেন দুঃখে প্রতিবেশীর মুখেও হালকা হাসির ঝলক। গাছটা এমন তরতর করে বেড়ে উঠছিল ওদের একটু হিংসে হবেই বৈ কি!

এরকম গল্প করতে করতে আমরা দাদু নাতি মিলে নদীর ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। নদীর এমন মুমূর্ষু অবস্থা দেখে দাদু চোখের জলকে সংবরণ করতে পারলেন না। আমাকে বললেন, "জানো দীপু কত কোলাহল ছিল এই গ্রাম বাংলার নদীতে? উচ্ছ্বল তরঙ্গে খেলে যেত সেসব ছোট ছোট ঢেউ। বরষার মৌসুম নদী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হত। জল নেমে যাওয়ার প্রারম্ভে এই নদীতে চলত 'বাউচলি'..."

"বাউচলি কি দাদু?"

"তোমাদের শহুরে ভাষায় বললে বলতে হয় প্রমোদতরী। তবে আমার মনে হয় এই 'বাউচলি' শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে 'বেয়ে চলি'' ধারণা থেকে।"

"পুরোটা বলো না..."

"শোন তাহলে, জল নেমে যাওয়ার আগে বিভিন্ন গ্রাম হতে 'বাউচলি' বের হয়। 'বাউচলি' একটি আঞ্চলিক শব্দ। তবে এর নাগরিক অর্থ দাঁড় করালে বলা যায় — 'প্রমোদতরী।' ভরা নদী কিন্তু ঢেউয়ের সেই উচ্ছ্বলতা নেই।

উৎস

বন্যার পানি কমতে থাকলেও নদী তখনও ভরপেটে জল ধারণ করছে এমন সময় বাউচলিতে বের হওয়ার উৎকৃষ্ট সময়। নৌকায় মাইক সেট করা হয়; গান বাজনা চলতে থাকে। নৌকার ভিতরে মেয়ে কিংবা কমন জেন্ডার নিয়ে নাচগান হয়। সেই গানের শব্দ কানে এলে গ্রামের সকলে নদীর পাড়ে ছুটে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাউচলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নদীর পাড় দিয়ে দৌড়াতে থাকে। দুর্দান্ত এক সময়। দৌড়ানো চলতেই থাকে; দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা বুঝতে পারে — বাউচলিকে ধরা সম্ভব নয়। ফলে সেখানেই থেমে যেতে হয়। জীবনের পথেও যখন চলতে শুরু করি তখনও দৌড়াতে হয়; দৌড়াতেই হয়। থেমে থাকার নাম জীবন নয়। তবে কখনো কখনো বিরতির প্রয়োজন হয় তখন থেমে যেতে হয় কিছুক্ষণের জন্য।"

"বাউচলি আনন্দের হলেও এমন বর্ষায় তো কৃষকের দুর্দশার অন্ত থাকে না। তাই না দাদু?"

"তা বটে। বন্যার জল টান দিতে শুরু করে। প্রাণের স্পন্দন জাগে পল্লীগ্রামে। ভাঙা গড়ার খেলায় সৃষ্টির এক স্বপ্নিল আনন্দ কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। কতদিন পর মাঠে যেতে পারবে সেই আনন্দ কৃষক-মনকে নতুন করে আশা জাগায়। জীবন যেখানে যেমন সেখানে জীবন সেভাবে না চললে বড়ই বেমানান বোধ হয়; অনেকটা 'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে''-এর মতো। ভোরের লাল

উৎস

টকটকে সূর্যটা বেলা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর হতে অধিক প্রখররূপে আবির্ভূত হয়। তবুও কৃষকের পিঠ তা ভেদ করতে পারে না। সর্বংসহার মতো সয়ে যায় ওরা। না সয়েই বা উপায় কি! ‘যে সহে সে রহে’ কথাটা মনে হয় ওদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এদেশ সোনালী আঁশের দেশ। বর্ষার সময়ে গ্রাম বাংলায় গেলে তার নমুনা চোখে পড়ে। চারদিকে একটা আঁশটে গন্ধের আঁচ পাওয়া যায়। পাট পঁচানোর ফলে একটু আধটু গন্ধ হয় বৈ কি! তা হোক; এই গন্ধে মিশে থাকে কৃষকের স্বপ্ন। এই পাট বিক্রি করে সংসার চালানো; ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর খরচ চালাতে হবে — সেই স্বপ্নের কাছে এই গন্ধ মামুলি ব্যাপার।

পাট পচানোর জন্য জলের নিচে জাগ দিতে হয়। পাট হতে সোনালী আঁশ ছাড়াতে কৃষকেরা ব্যস্ত সময় পার করে। যে রাস্তাটা জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল; সেটাও শুকিয়ে যায়। মাছ মারার চটকা তখনও গুছিয়ে রাখা হয়নি। চটকা কি জানো তো দাদুভাই?”

“এইটুকু জানবো না!”

“তাহলে বলো...”

“চটকা হল মাছ মারার এক ধরণের ব্যবস্থা যেখান চারটে বাঁশের ফালি দিয়ে জালকে আটকে একটি বড় বাঁশের সাহায্যে জালকে জল ফেলতে হয় আবার জল থেকে

তুলতে হয়। এই পদ্ধতিতে মাছ শিকার করা হয়।"

"ঠিক তাই।"

"শোন, বর্ষার সেইসব দিনের কথা বলি। সপ্তাহখানেক চলবে পাটের আঁশ ছড়ানোর সিজন। পাটের আঁশ ছড়িয়ে রোদে শুকানো হবে। তারপর পাটকাঠিও রোদে শুকিয়ে তার গায়ে যে আঁশ লেগে থাকে সেগুলো আগুনে পোড়ানো হবে। ছোট ছেলেমেয়েরা পাটকাঠির গাড়ি বানিয়ে খেলা করে।"

"তুমিও পাটকাঠির গাড়ি নিয়ে খেলা করেছিলে?"

"আলবত।"

"কত রকমের সংস্কার-কুসংস্কার আছে এই পাটকাঠি নিয়ে। একজন বাচ্চা আর একজনকে পাটকাঠি দিয়ে সহজে মারতে চায় না; এমনকি ঝগড়ার সময়ও না। যুগ যুগ ধরে কথিত আছে, পাটকাঠি দিয়ে কাউকে মারলে যাকে মারা হবে তার বড়সড় কোন রোগ হবার আশঙ্কা আছে। তবে ভুলক্রমে পাটকাঠি দিয়ে মারলে এই বড়সড় রোগ হতে পরিত্রাণের অভিনব উপায়ও আছে। পাটকাঠি দিয়ে মারার পর দাঁত দিয়ে পাটকাঠিটা কামড়ে দিলে সব বিপদ কেটে যায়। আহা! কি কার্যকরী সমাধান!"

আর দু'একদিনের মধ্যে মাঠ হতে সমস্ত জল নেমে যাবে। সম্ভবত সবগুলো ধানের চারা নষ্ট হয়েছে; পাটের আঁশ ছড়ানো শেষ হতে না হতেই আবার নতুন করে ধান লাগাতে হবে। প্রতিটা বন্যার পর নতুন আশায় বুক

বাঁধেন গ্রাম বাংলার কৃষক। জীবন এখানে নিষ্ঠুর বটে তবে একমুঠো ধানের কাছে সেই নিষ্ঠুরতা তুচ্ছ। এখানে ঘামের দাম সস্তা বটে, তবে সে ঘাম দেশের মানুষের মুখে অন্ন যোগায়।

জীবন যেখানে যেমন সেখানে সেভাবে জীবন পরিচালিত না হলে জীবন মাথা ঠুকে মরে। সেই আর্তনাদ আমাদের কানে আসে না; সেই বোবাকান্না আমাদের নাগরিক জীবনের সোডিয়াম আলোয় ম্লান হয়ে যায়। তবে ঝলমলে শহরের সেই আলো গ্রামের ঘুটঘুটে অন্ধকারে একদিন হারিয়ে যায়। কারণ গ্রামের সেই চেনা পথ মানুষকে টানে নিজের দিকে। গ্রাম হল দেশের শিকড়। মানুষ! আহা রে মানুষ — ফিরে যেতে চায় তার শিকড়ের কাছে। শিকড়হীন নাগরিক জীবনের বিতৃষ্ণা মানুষকে শান্তি তো দিয়েছে ঠিকই তবে স্বস্তি দিতে পারেনি। ...ক্রমশ ■

‘গুঞ্জন’এর ২০২১ এর বাকী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

অক্টোবর – পূজা সংখ্যা

নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

স্বাধীনতা তুমি

কাজী আনারকলি (বাংলাদেশ)

স্বাধীনতা তুমি, নীল আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ,
ঝড় ঝঞ্ঝার বজ্র কঠিন অশরীরী হাত।
গঙ্গার বুকে ঢেউ উচ্ছ্বাস স্বর্ণ কমল,
ফেরারী পাখির ঈপ্সিত জয়, বায়ু নির্মল।

স্বাধীনতা তুমি, জাতির পিতার হৃদয়ের মাঠ,
বনের সেঁজুতি ফুল, সুবাসিত চন্দন কাঠ।
মায়াবী বিকেল, বাগিচার ফুল, প্রজাপতি নীল,
গগনের নীচে উদাসী স্বপ্ন; উড়ন্ত চিল!

স্বাধীনতা তুমি, শ্রাবণের ঢল, বসন্ত রাগ,
ঝর্নার তান, নদী আনচান, সমুদ্র শাঁখ।
নবান্ন সুখ, কাঠ ফাটা রোদ, চৈতালী খেলা,
বারো মাসে তেরো পার্বণ আর বৈশাখী মেলা।

স্বাধীনতা তুমি, অরূপ প্রভাত, সবুজের হাট,
অনিন্দ্য সুখ, কৃষকের মুখ, ফসলের মাঠ।
পবনের চোখ, নগ্ন দুপুর, নৌকার পাল,
শুভ্র আঁচলে ঢাকা টোল পড়া কৃষাণির গাল।

প্রতিচ্ছবি

স্বাধীনতা তুমি, মরমী গানের ভাটিয়ালি সুর,
বলাকার সারি, স্বদেশী পতাকা, পথ বহু দূর।
প্রেয়সীর সাথে বিজন বাসরে কানামাছি খেলা,
কল্প তরুর স্বপ্ন সুখের পড়ন্ত বেলা।

স্বাধীনতা তুমি, ভেজা সন্ধ্যার জোনাকির আলো,
তিমির রাতের মায়াবী চোখের পিউপিল কালো।
শত শহীদের রক্ত ঋণের পলাশ মুকুল,
বিজয়ী বীরের বুকটান হাসি শিউলি বকুল। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ জলদাপাড়ায় শুঁড়ি পথে...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ নীলাম্বরী...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

স্বাধীনতার স্বাদ-গন্ধ

সামিমা খাতুন

স্বাধীনতার গন্ধে ভরুক সকলেরই মন,
শিকল ভেঙে মুক্ত হোক সকল বন্ধন।
ভাগ্যের হাতে জীবন-রেখা,
ভুলে নিয়মের খেলা,
নয়তো সহজ স্বপ্ন দেখা,
কঠিন এগিয়ে চলা।

স্বাধীনতার স্বাদ পায় কি সেই অভাজন,
বেকারত্বের জ্বালা যাকে করছে দংশন!
পিঠ বাঁচানোর লড়াই নাকি,
দেওয়াল কথা বলে?
দিন-রাতের চেষ্টা ফাঁকি,
যখন সবই বিফলে।

স্বাধীনতার অর্থ বোঝে কি সেই মেয়েটি,
দশভুজা গিন্নি হয়ে ফেলে খেলনা-বাটি!
কারো কাছে পুতুল হাতের,
কারো কাছে দাসী,
বুঝতে হিসেব আপন-পরের,
আট হয় আশি।

 Background Photo by cottonbro from Pexels

অনুভব

স্বাধীনতার রঙ লাগে কি সেই মায়ের গায়ে,
সন্তানের জীবন সাজায় নিজে না খেয়ে?
বড়ো হয়ে পাতে সে,
নিজের সুখের সংসার,
লাঠি হাতে বুড়ির যে
আর নেই দরকার।

স্বাধীনতার ছোঁয়া লাগুক সবারই অন্তরে,
অবসাদের আঁধার কাটুক অজানা মন্তরে।
সমাজ বড়ো বিশাল ব্যাপার,
তবু মানুষ জীবটা সামাজিক,
তার ওঠা-বসা, খাওয়া-ঘুম,
সবই সমাজের নিয়ম-মাফিক। ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

স্বাধীনতা তুমি

গোবিন্দ মোদক

স্বাধীনতা তুমি এককালে ছিলে পরম আকাঙ্ক্ষার,
স্বাধীনতা তুমি দামাল ছেলের রক্ত দুর্নিবার!
স্বাধীনতা তুমি বঞ্চনা, ক্ষোভ, পরাধীনতার জ্বালা,
স্বাধীনতা তুমি শহীদ-রক্তে গেঁথেছো বরনমালা!
স্বাধীনতা মানে অগ্নি-শপথ, জীবন-মরণ পণ,
স্বাধীনতা মানে দেশের জন্য আত্ম-নিবেদন!
স্বাধীনতা মানে প্রতিবাদী মন, মুষ্টিবদ্ধ হাত,
স্বাধীনতা মানে অমানিশা শেষে নতুন সু-প্রভাত!
স্বাধীনতা তাই নয়কো কান্না, নয়কো দীর্ঘশ্বাস,
স্বাধীনতা তাই জীবনের বলি, হয়ে যাওয়া ইতিহাস!
স্বাধীনতা তাই দৃপ্ত শ্লোগান, আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা,
স্বাধীনতা তাই উন্নত শির, জাতীয়তাবাদে দীক্ষা!
স্বাধীনতা মানে নেতাজি সুভাষ, বিনয়-বাদল-দীনেশ,
স্বাধীনতা মানে ক্ষুদিরাম কত, গণনার নেই শেষ!
স্বাধীনতা মানে সূর্যসেন, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী,
স্বাধীনতা মানে নতুন ভারত এঁদের কাছেই ঋণী!
স্বাধীনতা সেই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,
স্বাধীনতা সেই দেশমৃত্তিকার ক্ষয়ে যাওয়া সোনা-চাঁদ!

বাস্তব

স্বাধীনতা সেই স্বপ্ন-স্বরাজ, নিজেরই অধিকার,
স্বাধীনতা সেই চেতনা-সূর্য, হারিয়েছে বার বার!
তবু স্বাধীনতা নিজের মনেই প্রশ্ন চিহ্ন আঁকে,
চোখের কোণেতে ব্যথার কাজল থমকিয়ে যেন থাকে!
পতপত্ ওড়ে তেরঙা নিশান, রং হয়ে যায় ফিকে,
অবক্ষয়ের কালো মেঘ যেন ছেয়ে থাকে চারিদিকে!! ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
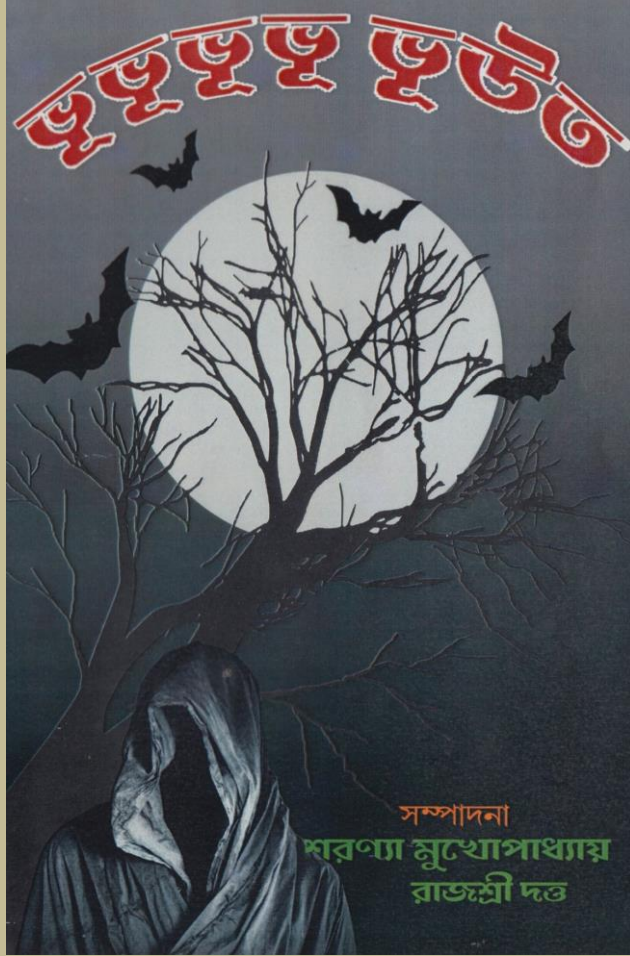
মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

বেঁচে থাকা

পল্টু ভট্টাচার্য

সত্তরে পা দিয়েও পাঁচুদা আজও একা, তাই বলে মনে কোনো ক্ষোভ নেই। বরাবরই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে – রোজগার কম, বেশি দায়-দায়িত্ব নিতে গেলে চটকে চুয়াল্লিশ হয়ে যাবেন। তাই এতগুলো বছর বেশ আরামে কাটিয়ে দিলেন। বাড়ি, বংশলতা, জমিজমা সবই একে একে বন্ধক হল, শেষমেষ এক প্রোমোটারের ক্ষমা-ঘেন্নায় একটা চারশো বর্গফুটের গ্যারেজে জীবন কাটাচ্ছেন তিনি।

জানি না অদূর ভবিষ্যতে গাড়িরা থাকলে পাঁচুদার গতি কি হবে! তবে জীবন দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি... তাই পাঁচুদাকে পাড়ার পাঁচজনে মিলে লিঙ্গভেদ ছাড়াই দেখভাল করে। পাঁচুদাও এইসব সাহচর্য খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করেন। তবে কোথা থেকে এক ঝোড়ো মেঘের মতো হাজির হলো কোভিদ।

সব সুখ, আনন্দ, পরিতোষ, অশন, বসন শিকেয় উঠল, কারণ দেখা যাচ্ছে দূরত্ব বিধি মানতে গিয়ে কেউ আর কারোর মুখোমুখি হয় না। যে কোনো জিনিসকে চোদ্দবার ধুয়ে মুছে পাঁচুদার সামনে হাজির করে সবাই। বুক ফেটে

জীবন

কান্না আসে খিদে পেলে, খাবার আসতে আসতে খিদে মরে যায়। অনেক সময় মরে যাবার উপক্রমও হয়, কারণ বিধির বিধানে আগের মত বললেই তো আর খাবার আসবে না। তাই চতুর্দিকের ঝামেলা সামলে খাবার মুখে দিতে হয়।

যাক, ‘হোয়েন ইউ আর ইন রোম, বিহেভ লাইক এ রোমান।’ মাঝদুপুরে বা রাতে, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে পাঁচুদার ঘুম ভেঙে যায়। বেলায় খবর আসে পরিচিত কারুর মৃত্যুর। মন ভেঙ্গে যায়, তবু মনের জোর ঠিক রাখতে, পাঁচুদা বহু পুরানো দিন বা ছোটবেলার কথা খুব স্মরণ করে। বাস্তব ছেড়ে তারা স্বপ্নতে বেশি ভিড় করে, ফলে মনটা ভাল-মন্দের মাঝামাঝি নাচানাচি করে। সেদিন বিকেল বেলায় মন্টুর মা কয়েকটা আলুর চপ দিয়ে গেলেন। খুব মৌতাতে পাঁচুদা সেগুলো খেলেন। পরে যখন চা দিতে এলেন বৌদি, তখন পাঁচুদা বললেন – জবাব নেই বৌদি, আপনি তো দ্রৌপদী। মন্টুর মা বললেন – দাদা ওই অভিশাপটা আর দেবেন না, তাহলে তো আরো চারটে স্বামী জোগাড় করতে হবে। হাসতে হাসতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মন্টুর মা বাড়ি ফিরে গেলেন।

আসলে পাঁচুদা একটা পঞ্চরত্ন, তাই সবাই ওনাকে নিয়ে মজায় থাকে, আর তাই পাঁচুদার কর্তব্যবোধও একেবারে ভীষণ ভীষণ টনটনে। কারোর কোন বিপদ-আপদ সামাজিক প্রয়োজন ঘটলে, একমাত্র উপায় ‘কল’ পাঁচুদা। এই তো

জীবন

সেদিন নীহার জার্মানি থেকে ফিরল রাত আড়াইটেতে। পাঁচুদা এয়ারপোর্টে একাই হাজির। নীহারকে নিয়ে ভোর চারটের মধ্যেই বাড়িতে হাজির।

ব্যস, তারপর কাপের পর কাপ চা আর গাঁজানি। নীহার প্রণাম করে, পাঁচুদাকে একটা ল্যাপটপ দিল। পাঁচুদার আনন্দ আর ধরে না। চিৎকার করে তিনি বলে উঠলেন – ওরে এটা যে আমার অনেক দিনের শখ। কি করে বুঝলি নীরু? নীহার বলল – বা'রে বাড়িতে অঙ্ক কষাতে কষাতে বসে তুমি কতদিন ল্যাপটপের গল্প বলতে না...

দু'চোখ জলে ভরে এল, পাঁচুদার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই যে তাঁর কাছে পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি শেখা নীহার আজ জার্মানিতে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। যাই হোক, এই গাঁজানি যখন তুমুল পর্বে চলছে, তখন সবাই জানল যে নীহার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে। আসরে একটা খুশীর জোয়ার বয়ে গেল। এমন সময় আসর ভঙ্গ হলো নীহারের বাবার হাঁকে। উনি বললেন নীরু এখন থেকে দিন পনের তুই তোর ওই চিলেকোঠার নিজের ঘরটাতেই থাকবি, কোন ওজর আপত্তি শুনলেন না উনি। এখন থেকে চলবে দূরত্ব বিধি কানুন।

নীহার ভিজে বেড়াল, সে মনে মনে খুশি, এই ভেবে যে পাশের বাড়ির গুনগুন-এর সাথে জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। ওরা শিগগিরই শুভ কর্ম সেরে জার্মানি ফিরে যাবে। ছাব্বিশ

বছরের প্রেম, ছেলেখেলা নয়।

সে যা হোক, পাঁচুদা নীরু আর গুনগুনের ব্যাপারটা সমর্থন করেন। দু'জনেই ওনার কাছে অঙ্ক শিখত, তাই অঙ্কের নিয়ম মেনেই ওদের প্রেম, ওদের ভালোবাসা। এক বর্ষার বিকেলে দু'জন গান ধরেছে "আমার জ্বলেনি আগুন..." দূর থেকে পাঁচুদা ওদের উদ্দেশ্যে বললেন – ভগবান তোদের সুখী করুন। মিটে গেছে কোভিদ পর্ব, দূরত্ব বিধি এখন শিথিল, হঠাৎ নীরুর ডাক পড়ল জার্মানিতে।

কি একটা জরুরী কাজে কোম্পানিতে রিপোর্ট করতে হবে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে। সবার মন খারাপ করে দিয়ে নীরু চলে গেল। গুনগুনকে সে বলে গেল – আমি শিগগিরই ফিরে আসব, তারপর আমরা খুব আনন্দে বাঁচব।

বিধির অমোঘ বিধান, ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছেই প্লেন ক্র্যাশে নীরু চলে গেল নাম না জানা দেশে। সেই থেকে গুনগুন নীরুর বাবা-মার কাছেই থাকে। নিজের বাড়িতে কম যায়। সে নীরুর মাকে বলে – তার পক্ষে অন্য কোথাও বিয়ে করা সম্ভব নয়। কলেজে সে ইতিহাসের অধ্যাপিকা। নীরুর মা বলেন – তুই বাঁচবি কি করে? সলাজে গুনগুন বলে – তোমার ছেলে আমার শরীরে তার একটা চিহ্ন রেখে দিয়ে গেছে। সেটাকেই বড় করে আমি বাঁচতে চাই।

##

না, আজ ঐতিহাসিক নিরুপমা ওরফে গুনগুন দেবীর

জীবন

চোখে জল থামতে চায় না। সত্তরের কাছাকাছি বয়সে, আজ তিনি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হল জার্মান গণতন্ত্র।

পুরো টাকাটাই উনি নীহার চ্যারিটেবল ট্রাস্টে দান করলেন। অধ্যাপিকা ছেলেকে বললেন – এর নাম ভালোবেসে বেঁচে থাকা। তোর বাবা বলেছিল, আমরা আনন্দে বেঁচে থাকব। আচ্ছা খোকা, বুকে হাত দিয়ে বলতো – এটা কি বেঁচে থাকা নয়? তোর বাবাকে তো আমি কোনদিন ভুলতে পারব না... আস্তে আস্তে গুনগুনের আঁচলটা চোখ মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল... ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।
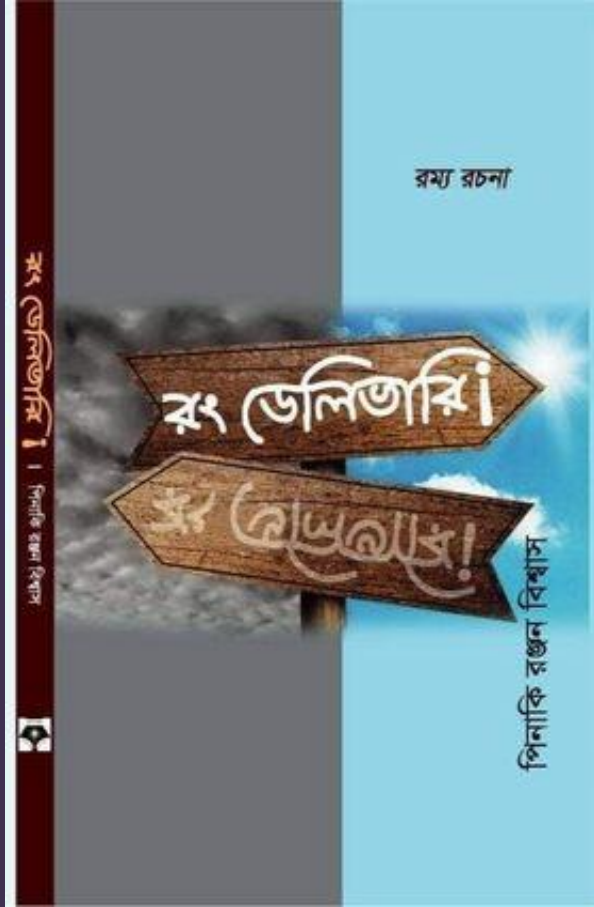
প্রশ্ন

খোদার কাছে খোলা চিঠি

দালান জাহান (বাংলাদেশ)

বলে দাও হে, মহান খোদা
কিভাবে আমরা শোক উৎযাপন করব
প্রতিটি বুলেটের সাথে
আমাদের কান্নাগুলো আযানের ধ্বনি নিয়ে
মিশে যায় মাটির প্রাসাদে
অগণিত এই মৃত্যুর লড়ি ছেড়ে
আমরা কেমন অথবা
কোন জীবনের দিকে এগিয়ে যাব?

হাজার প্রশ্ন নিয়ে কোথায় চলে যায়
নিঃশ্বাসে প্রবাহিত রক্তধলা
মরু-মানুষের শিরায় শিরায়
কোথায় জড়ো হয় রক্তজলা?
কতকাল কতো অবুঝ মৃত্যুর পর
আমরা আমাদের ফিরে পাবো
বলে দাও! বলে দাও হে, মহান খোদা
কিভাবে আমরা এই শোক উৎযাপন করব?

আমরা শুধুই কী মৃত্যুর জন্য জন্মি
মৃত্যুর জন্য বড়ো হই?
না, আমাদের রক্তে বহমান সোনার খনি
বিপুলা পৃথিবীর আনন্দ হৈচৈ। ■

হাট-বাজারের গল্প

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি কে)

রাস্তার দিকে চেয়ে, ঘরের দালানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল মোহানা, দিন সাতেক জ্বরে ভোগার পর আজই প্রথম বাইরে বেরিয়েছে দীননাথ, ওরফে দিনো। সেই দুপুরে বেড়িয়েছিল, বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে, কিন্তু বিকাল গড়িয়ে এখন সন্ধ্যাও ঢলতে চলল, মানুষটার দেখা নেই। কোথায় যে গেল!

##

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বাড়ির সামনের রাস্তাটা মাটির ছিল। বর্ষা কালে এক হাঁটু জল জমত, এখন আর তা হয় না, দু'পাশে মাটি কেটে নর্দমা বানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েতের লোকেরা। রাস্তার ওপর সিমেন্টের কনক্রিট ঢেলে দেওয়ায়, আর তত পিছলও এখন নেই। গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্রও খোলা হয়েছে, সব মিলিয়ে এক উন্নয়নের ছোঁয়ায় গ্রামের সেই পুরান ছবিটা খুব তাড়াতাড়িই পাল্টে যাচ্ছে। অবশ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোজ একজন লিপিক থাকলেও ডাক্তার বা নার্সদের দেখা মেলে মাসে দু'একবারই। আর কখনও কখনও ভাগ্য ভাল থাকলে দু'একটা জ্বর-সর্দির বড়ি মিলে যায়।

নর্দমাগুলো বড় গভীর করে বানিয়েছে পঞ্চায়েত। বর্ষা কালে কোন মানুষ পড়ে গেলে জলের তোড়ে যে কোথায়

ভেসে যায়, তার খবর আর কেউ পায়না। এইতো গত বছর, বাউন পাড়ার গোপেন মুখুজ্জের দেহটা ওই নর্দমা দিয়ে ভেসে গিয়েই আটকাল মোড়ের মাথার কাছে।

রাতে পার্টি অফিস থেকে মিটিং সেরে ফিরছিল গোপেন, হালকা বৃষ্টি পড়লেও, সবাই জানে সেদিন নর্দমার জল তেমন গভীর ছিলনা, কিন্তু কি করে যে গ্রামের সাঁতার জানা ছেলে গোপেন নর্দমায় পড়ল – আর অতদূর ভেসে গেল, সেটাতো রহস্যই হয়ে রয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

##

গোপেনের মৃত্যুর আগেও ঐ সর্বনেশে নর্দমায় আরও কয়েকটা লাস ভেসে এসেছিল। কয়েকটাতো বেশ শুকনো খটখটে দিনে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ পাওয়া যায়নি। লোকে বলে ঐ নর্দমাটাই নাকি অভিশপ্ত মানুষকেও টেনে নেয়।

মোহানার আজকাল বড় ভয় হয়। সে তো বাড়ির বাইরে বেরোয়না, কিন্তু দিনোকেতো যেতেই হয়। মাঝে মাঝেই সে পার্টি অফিস থেকে ফিরতে রাত করে। সামনেই নির্বাচন, ছোটখাট গোলমালতো লেগেই থাকে। প্রতিবেশীরা আজকাল ওদের সাথে কথা বলে না। সবাই দল পরিবর্তন করে নিয়েছে, কিন্তু দিনো তার আদর্শে অটল, অনেক প্রলোভন তাকে দেখান হলেও, সে কিছুতেই দল বদল করতে রাজী হয়নি।

##

রাতের রান্নাবান্না সেরে মোহানা আবার দালানে এসে

দাঁড়ায়। দিনো এখনও ফেরেনি। কয়েকটা ছেলে নর্দমায় টর্চ লাইট ফেলে কি যেন দেখতে দেখতে চলে গেল। একজন দু'একবার মোহানার মুখের ওপর তার হাতের টর্চটার থেকে আলো ফেলছিল। তারপর বাকীরা কিছু বলায়, সে টর্চটা অফ করে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ খিড়কির দরজায় কারুর ঠকঠকানি শুনে মোহানা চমকে উঠল। ত্রস্ত ভাবে দরজা খুলে সে দেখল – রক্তে ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিনো। মোহানা কিছু বলার আগেই, সে তার মুখটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল – চল্ এ গ্রাম ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে, আজ, এখনই, এই রাতের অন্ধকারের মধ্যেই... ■

স্বাধীন

রিয়া মিত্র

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বড় হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে ছিল ছোট ঝুমকি। কি সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে কত গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে, কত টাকা ওদের! মায়ের কাছে 'বর্ণ পরিচয়' পড়েছে ঝুমকি। বানান করে করে সে পড়ল, 'স্বাধীনতা' দিবস উপলক্ষ্যে সোনার গয়নায় ৩০% ছাড়।

পাঁচ বাড়ি বাসন মাজার কাজ করে ঝুমকির মা মলিনা। মায়ের হাত ধরে ঝুমকি আজ পাড়ার মোড়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা দেখতে এসেছে। এখানে নাকি পতাকা তোলার পর ইয়া বড় বড় লাড্ডু দেবে। উফ্, ভাবলেই এখনই জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে ঝুমকির।

দু'হাতে দুটো লাড্ডু নিয়ে খুব আয়েশ করে খেতে খেতে মার সাথে বাড়ি ফেরার পথ ধরে ঝুমকি। মায়ের লাড্ডুটাও মা তাকেই দিয়ে দিয়েছে। মা'র দিকে তাকিয়ে ঝুমকি জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, স্বাধীনতা দিবস মানে কী?"

মলিনা মেয়েকে কি বোঝাবে ভেবে না পেয়ে বলল, "ঐ যখন নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করা যায়, কারও কথা শুনে চলতে হয় না, তখনই আমরা স্বাধীন হই।"

ঝুমকি লাড্ডুর কিছুটা অংশ মুখে পুরে বলল, "মা,

তাহলে রোজ কেন এরকম স্বাধীনতা দিবস হয় না?”

মলিনা হেসে বলল, “কেন রে, ঝুমু?”

ঝুমকি বলল, “তাহলে আমিও রোজ লাড্ডু খেতে পারতাম আর হোর্ডিং-এর ঐ সুন্দর মেয়েটাও সবাইকে সোনার গয়নায় ছাড় দিতে পারত, তাহলে সবারই প্রতিটা দিন খুব আনন্দের হত।”

মলিনা হা হা করে হেসে বলল, “না রে, বোকা মেয়ে, সোনা কম দামে কিনতে পারলেই বুঝি স্বাধীন হওয়া যায়?” ঝুমকি অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, “তবে!”

মলিনা রাস্তার ধারে নুইয়ে পড়া একটি ফুলের গাছ থেকে কাপড়ের কোঁচায় ভর্তি করে কিছুটা ফুল নিল, তারপর মেয়েকে বলল, “চল্, ঝুমকি, আজকে তোকে স্বাধীনতার মানে বোঝাব।”

বাড়িতে ফিরে ফুলগুলো দিয়ে যত্ন করে ফুলের মালা গাঁথল মলিনা। ঝুমকি অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে, মা কি করে, তা বোঝার জন্য। মেয়ের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে দিতে মলিনা বলল, “অন্যের কথা মতো দাম দিয়ে সোনার হার পরা তো স্বাধীনতা নয় রে মা, এই যে প্রকৃতির দান এই ফুলগুলো যে আমি কারও অনুমতি না নিয়েই তুলতে পারলাম আর তা দিয়ে বিনামূল্যে গয়নাও পরতে পারলাম, এ'টাই তো ‘স্বাধীনতা’। প্রকৃতির কাছে সকলে স্বাধীন। প্রাকৃতিক দান গ্রহণ করতে অন্য কারও অনুমতি

লাগে না। তাই, সোনার হারের চেয়ে এই ফুলের হারেই আমাদের স্বাধীনতা লুকিয়ে রয়েছে, ঝুমু।” ছোট ঝুমকির আনন্দ তখন দেখে কে! হোর্ডিং-এর গয়না পরে থাকা মেয়েটার থেকেও নিজেকে এখন যে বেশি সুন্দরী লাগছে তার। ফুলের গয়না পরে আজ যে সে ‘স্বাধীন’... ■

যে প্রচলিত ভুলে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে।

প্রচলিত তিনটি ভুল

✗ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

✗ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

✗ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।

গুঞ্জন গড়ুন ~ গুঞ্জন গড়ান

দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত